Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

IOM
Islamic Online Madrasah

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন হাদিসের আলোকে শবে বরাতের করনীয় ও বর্জনীয়

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাহমিনা আক্তার

রোলঃ 216021220

২৯ মে,২০২৪ ইং

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

রিসার্চের বিষয়ঃ

কুরআন হাদিসের আলোকে শবে বরাতের করনীয় ও বর্জনীয়

এই রিপোর্ট টি ইসলামিক অনালাইন মাদ্রাসার ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজের একটি আনুসাঙ্গিক রিপোর্ট।

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ

রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

জমা দিয়েছেনঃ

তাহমিনা আক্তার

রোলঃ 216021220

Through Knowledge towards Jannah

Islamic Online Madrasah – IOM

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ

প্রত্যয়ন পত্র

এই মর্মে প্রত্যয়ন করা যাচ্ছে যে, "কুরআন হাদিসের আলোকে শবে বরাতের করনীয় ও বর্জনীয়" বিষয়ক গবেষণাপত্র টি আমার তত্ত্বাবধানে ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ ডিপার্টমেন্ট থেকে তাহমিনা আক্তার, আইডিঃ 216021220 বিচক্ষনতার সাথে সম্পন্ন করেছেন।

(স্বাক্ষর)

(স্বাক্ষর)

তত্ত্বাবধায়নেঃ

মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ
রিসার্চ ডিপার্টমেন্ট।
ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা – আইওএম

এক্সটারনালঃ

নাম:
ডিপার্টমেন্ট:
প্রতিষ্ঠান:

ঘোষণাপত্র

আমি নিম্নস্বাক্ষরকারী এ মর্মে ঘোষণা করছি যে, " কুরআন হাদিসের আলোকে শবে বরাতের করনীয় ও বর্জনীয় " শিরোনামে এই গবেষণাপত্র ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসার (Islamic Online Madrasah – IOM) ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ বিভাগের মুফতি: আব্দুল ওয়াহিদ উস্তাদের প্রত্যক্ষ তত্ত্বাবধানে ও নির্দেশনায় সম্পন্ন করেছি। অন্য কোন বিশ্ববিদ্যালয় বা প্রতিষ্ঠানে কোন প্রকার ডিগ্রি/ডিপ্লোমা অর্জনের জন্য বা প্রকাশের জন্য গবেষণাপত্র সম্পূর্ণ কিংবা এর অংশবিশেষ উপস্থাপন করা হয়নি।

আমি আরও ঘোষণা করছি যে, এই গবেষণা কর্মটি আমার নিজস্ব মৌলিক রচনা। আমার জানা মতে ইতিপূর্বে আর কোন ব্যক্তি এই শিরোনামে কোন গবেষণাপত্র রচনা করেননি।

তাহমিনা আক্তার

(স্বাক্ষর)

তারিখঃ

২৯ মে, ২০২৪ ইং

তাহমিনা আক্তার

আইডিঃ 216021220

ব্যাচেলর ইন দাওয়াহ এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ।

ইসলামিক অনলাইন মাদ্রাসা।

সূচিপত্র

ভূমিকা..5

প্রান্তিকতামুক্ত,ভারসাম্যপূর্ণ সহাবস্থান সম্পর্কিত একটি পর্যালোচনাঃ শবে বরাত...............6

শবে বরাতের প্রমাণ ও ফজিলত 7

শাবান মাসের করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত...10

শবে বরাতের আমল..16

শবে বরাতের বর্জনীয় কাজ...18

রেফারেন্সঃ 22

ভূমিকা

শবে বরাত নিয়ে আমাদের উপমহাদেশে নানা রকম কথা প্রচলিত আছে। এতে যেমন বিভিন্ন অনুষ্ঠানিকতার প্রচলন রয়েছে তেমনি রয়েছে শিরক বিদআতের মতো কাজ। বিভিন্ন মতের মানুষজন নিজেদের মতো, নিজেদের বানানো রীতি-রেওয়াজ পালন করে। তারা কোন বিজ্ঞ আলিমের কথা শুনতে চায় না আর তারা কোন দলিলও জানতে চায় না। তারা তাদের পছন্দনীয় অর্ধশিক্ষিত আলেমের কথা শুনে আর দেখে সমাজ কি করে। এভাবে মানুষ সঠিকটা না জেনে এবং জানার চেষ্টা না করেই বাপ-দাদার দোহাই দিয়ে জীবন পার করছে।অথচ মানুষকে আল্লাহ তাআলার ইবাদত করতে হবে। আর সে ইবাদত হতে হবে কোরআন হাদিসের আলোকে, নিজের মনগড়া মতো ইবাদত করলে হবে না।আমাদের অবশ্যই এ ব্যপারে সচেতন হওয়া দরকার যে, আমাদের আকিদা-বিশ্বাস,ইমান -আমল ঠিক আছে কিনা।বস্তুতঃ আখিরাতে মুক্তির জন্যপ শিরকমুক্ত তাওহীদ ও বিদআন মুক্ত আমলের কোনো বিকল্প নেই।আল্লাহ আমাদের বুঝার ও মানার তৌফিক দান করুন।

প্রান্তিকতামুক্ত,ভারসাম্যপূর্ণ সহাবস্থান সম্পর্কিত একটি পর্যালোচনাঃ শবে বরাত

প্রতি বছর শাবানের পনেরো তারিখ আসলেই একটি বিষয়কে কেন্দ্র করে পক্ষে - বিপক্ষে নানা আলোচনা-সমালোচনা চলতে থাকে।কারও মতে এটা শবে কদরের মতোই বা তার চেয়েও দামী একটি রাত।বর ভিন্ন আরেকদলের নিকট এটা একেবারেই সাধারণ একটি রাত;যার কোনো বিশেষ ফজিলত বা গুরুত্ব নেই।আসলে বিষয়টি সম্পর্কে অজ্ঞতা কিংবা সঠিক পর্যালোচনার অভাবেই মানুষের মাঝে এমন ভুল ধারণার প্রসার ঘটেছে।এ বিষয়ে যেমন অধিক বাড়াবাড়ি কাম্য নয়, ঠিক তেমনি বেশি ছাড়াছাড়ি ও উচিত নয়। উভয় প্রান্তিকতাই বর্জন যোগ্য। উক্ত প্রবন্ধটিতে আমরা কোরআন সুন্নাহর আলোকে পূর্ণ সতর্কতার সাথে একটি তাত্ত্বিক পর্যালোচনা তুলে ধরছি।আশা করছি,এতে শবে বরাতে আমাদের করণীয় বর্জনীয় সম্পর্কে সঠিক ধারণা পাওয়া যাবে।

শবে বরাত নিয়ে মৌলিকভাবে তিনটি বিষয়ে বিতর্ক হয়ে থাকে।

এক.শবে বরাতের ফজিলত থাকা ও না থাকা নিয়ে।

দুই.শবে বরাতে সম্মিলিত ইবাদত করা ও না করা নিয়ে।

তিন.শবে বরাতের পরদিন রোযা রাখা ও না রাখা নিয়ে।

শবে বরাতের প্রমাণ ও ফজিলত

‘শবে বরাত’ ফারসি শব্দ।’শব’ অর্থ রাত, আর ‘বরাত’ অর্থ সৌভাগ্য। অবশ্য বরাতকে আরবি হিসেবে নেয়া হলে এর অর্থ হবে মুক্তি।সুতরাং এর অর্থ দাঁড়াল সৌভাগ্য বা মুক্তির রজনী। যেহেতু এই রাতে আল্লাহ তাআ'লা বান্দাদের গুনাহ থেকে মুক্ত করে সৌভাগ্যের চাদরে আচ্ছাদিত করেন,তাই এ রাতকে শবে বরাত বলা হয়।তবে মনে রাখা দরকার যে এটা ইসলামি বা শরয়ী কোনো পরিভাষা নয়।এ রাতের ক্ষেত্রে হাদিসে ব্যবহৃত শব্দ হচ্ছে,’লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান’ বা মধ্য শাবানের রজনী।ভাষার সহজবোধ্যতার জন্য একে শবে বরাত হিসেবেই আখ্যায়িত করা হয়

১৫ই শাবানের রাত অর্থাৎ ১৪ই শাবান দিবাগত রাতকে ফার্সী, উর্দূ ও বাংলা ভাষায় শবে বরাত বলা হয়। হাদীস শরীফে এ রাতকে ‘লাইলাতুন নিছফি মিন শাবান’ বলা হয়েছে। এ ব্যাপারে সঠিক ও ভারসাম্যপূর্ণ অবস্থান হল, এ রাতের ফযীলত সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত।

সম্মিলিত কোনো রূপ না দিয়ে এবং এই রাত উদযাপনের বিশেষ কোনো পন্থা উদ্ভাবন না করে বেশি ইবাদত করাও নির্ভরযোগ্য রেওয়ায়েত দ্বারা প্রমাণিত। এই রাতকে অন্যসব সাধারণ রাতের মত মনে করা এবং এ রাতের ফযীলতের ব্যাপারে যত হাদীস এসেছে তার সবগুলোকে ‘মওযূ’ বা ‘যঈফ’ মনে করা যেমন ভুল তেমনি এ রাতকে শবে কদরের মত বা তার চেয়েও বেশি ফযীলতপূর্ণ মনে করাও ভিত্তিহীন ধারণা।

বাড়াবাড়ি ছাড়াছাড়ি কোনোটিই উচিত নয়। যতটুকু ফযীলত প্রমাণিত এ রাতকে ততটুকুই গুরুত্ব দেওয়া উচিত এবং এ কেন্দ্রিক সকল মুনকার রসম-রেওয়াজ পরিহার করা উচিত। এই রাতের ব্যাপারে সরাসরি কুরআনে কোনো কিছু আসেনি।কিছু মানুষ সূরা দুখানের একটি আয়াত দ্বারা কুরআনে ‘শবে বরাত'এর অস্তিত্ব প্রমাণের চেষ্টা করে।কিন্তু এটা অধিকাংশ মুফাসসিরের মত ও নির্ভরযোগ্য তাফসিরের পরিপন্থী। তাই তাদের এ প্রচেষ্টা সঠিক নয় বরং অপব্যাখ্যার শামিল।

সূরা দুখানে ইরশাদ হয়েছেঃ

انا انزلناه في ليلة مباركه انا كنّا منذزين

নিশ্চয়ই আমি কুরআন অবতীর্ণ করেছি এক বরকতময় রাতে।নিশ্চয়ই আমি সতর্ককারী।(সূরা আদ-দুখানঃ৩)

বিশুদ্ধ মতানুসারে এ আয়াতে ليلة مباركة বা বরকতময় রাত বলতে শবে কদর উদ্দেশ্য, শবে বরাত নয়।যেহেতু এই ব্যাপারে সকলেই একমত যে,কুরআন শবে কদরে অবতীর্ণ হয়েছে।আর এ আয়াতে বরকতপূর্ণ রাতে কুরআন অবতীর্ণের কথাই বলা হয়পছপ।অতএব এ আয়াতে বরকতপূর্ণ রাত বলতে শবে কদর উদ্দেশ্য হবে শবে বরাত নয়।

ইমাম কুরতুবি রহ. বলেনঃ

বরকতময় রাত হলো শবে কদর।

ইকরামা রহ. বলেছেন,বরকতময় রাত এখানে শবে বরাত উদ্দেশ্য। তবে প্রথম মতটিই অধিক বিশুদ্ধ। কেননা,আল্লাহ তাআ'লা বলেন,"নিশ্চয়ই আমি কুরআন শবে কদরে অবতীর্ণ করেছি।"(তাফসিরুল কুরতুবিঃ১৬/১২৬,প্রকাশনিঃদারুল কুতুবিল মিসরিয়্যা কায়রো)

ইমাম ইবনু কাছির রহ. বলেনঃ

আল্লাহ তাআলা কুরআনের ব্যাপারে জানিয়ে দিলেন যে,এটাকে তিনি বরকতময় রাতে অবতীর্ণ করেছেন।আর সেটা হলো শবে কদর। যেমন আল্লাহ তাআলা বলেন," নিশ্চয়ই আমি কোরআন শবে কদরে অবতীর্ণ করেছি।" আর যারা বলে যে, এ রাতটি হলো মধ্য শাবানের রাত তথা শবে বরাত- যেমনটি ইকরামা রহ. থেকে বর্ণিত হয়েছে -তারা সত্য থেকে অনেক দূরে।কেননা কোরআনের সুস্পষ্ট ভাষ্য হলো,শবে কদর রমজান মাসে হয়।(তাফসির ইবনি কাসিরঃ৭/২২৫,প্রকাশনীঃ দারুল কুতুবিল ইলমিয়্যা,বৈরুত)

এ থেকে প্রমাণিত হয় যে,সূরা দূখানে যে বরকতময় বরকতময় কুরআনের কথা বলা হয়েছে তা শবে কদর উদ্দেশ্য, শবে বরাত নয়।

আমরা এবার দেখবো যে হাদিসে এর অস্তিত্ব আছে কিনা।নির্ভরযোগ্য হাদিসের গ্রন্থাদি অধ্যয়ন করলে শবে বরাত সংক্রান্ত বেশ কিছু হাদিস পাওয়া যায়।সনদগত দিক থেকে হাদিসগুলোর সনদ জইফ হলেও সামগ্রিক বিবেচনায় সব মিলে হাদিস সহিহ হয়ে যায়।

সহিহ ইবনু হিব্বানে বর্ণিত হয়েছেঃ

عن معاذ بن جبل،عن النبي صلى الله عليه وسلم قال :يطلع الله الى خلقه في ليله النصف من شعبان فيغفر لجميع خلقه الا لي مشرك او مشاحن

‘মুআজ বিন জাবাল রা.সূত্রে রাসুলুল্লাহ সাঃ থেকে বর্ণিত,তিনি বলেন,আল্লাহ তাআ'লা শাবান মাসের পনেরো তারিখ রাতে তার সৃষ্টি কূলের দিকে(বিশেষ রহমতের) দৃষ্টি দেন।অতঃপর মুশরিক ও হিংসুক ছাড়া সবাইকে ক্ষমা করে দেন।’(সহিহু ইবনে হিব্বান:১২/৪৮১,হা.নং ৫৬৬৫,প্রকাশনী:মুআসসাতুর রিসালা,বৈরুত)

এ হাদিসটির সমর্থনে আরো অনেকগুলো হাদিস আছে সেগুলো নিচে দেওয়া হলোঃ

১.সিলসিলাতুস আহাদিসিস সহিহঃ৩/১৩৫,হা.নং ১১৪৪

২.আত-তালিক আলা মুসনাদি আহমাদ:১১/২১৭,হা.নং ৬৬৪২

৩.মুসনাদ ইসহক বিন রাহুইয়াহঃ৩/৯৮১,হা.নং ১৭০২

৪.সুনানু ইবনে মাজাহঃ৪৪৫,হা.নং ১৩৯০

৫.আস-সুন্নাহ,ইবনু আবি আসিমঃ১/২২৩,হা.নং ৫১০

৬.মুসনাদুল বাজ্জারঃ ৭/১৮৬ হা.নং ২৭৫৪

এসব কিতাবে বর্ণিত হাদিসগুলোর সারমর্ম প্রায় একই।তবে এ রাতে আল্লাহ যাদেরকে ক্ষমা করবেন না তাদের আরো কয়েকটি শ্রেণির নাম জানা যায়।যেমন: তারা হলো

১)মদ্যপায়ী বা নেশাগ্রস্ত,২)মুশরিক বা শিরকে লিপ্ত,৩)কোনো মুমিন ভাইয়ের সাথে অন্যায়ভাবে বিদ্বেষ পোষণকারী, ৪)আত্মহত্যাকারী, ৫)আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্নকারী,৬)টাখনুর নিচে কাপড় পরিধানকারী,৭)পিতা-মাতার অবাধ্য সন্তান।

সুতরাং এতোগুলা হাদিস দ্বারা বুঝা গেলো যে,হাদিসের আলোকে শবে বরাত সুসাব্যস্ত একটি বিষয়।এমনকি আহলে হাদিসগন যাকে মান্যবর ইমাম মনে করেন,সেই শাইখ আলবানি রহ.-ও এর স্বীকৃতি দিয়েছেন।এছাড়া সালাফে সালেহীনদের অনেকেই এরাতের ফজিলতের কথা বলে দিয়েছেন।

শাবান মাসের করণীয় সম্পর্কে বিস্তারিত

আয়েশা রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রমযান ছাড়া শাবান মাসে সর্বাধিক রোযা রাখতেন। আয়েশা রা. বলেন—

فَمَا رَأَيْتُ رَسُولَ اللهِ صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ اسْتَكْمَلَ صِيَامَ شَهْرٍ إِلَّا رَمَضَانَ، وَمَا رَأَيْتُه أَكْثَرَ صِيَامًا مِنْهُ فِي شَعْبَان.َ

আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামকে রমযান ছাড়া অন্য কোনো মাসে পূর্ণ মাস রোযা রাখতে দেখিনি। আর আমি তাঁকে (রমযান ছাড়া) শাবান মাস অপেক্ষা অধিক রোযা রাখতে আর কোনো মাসে দেখিনি। —সহীহ বুখারী, হাদীস ১৯৬৯

আয়েশা রা. থেকেই বর্ণিত অপর এক হাদীসে আছে—

كَانَ أَحَبُّ الشُّهُورِ إِلَى رَسُولِ اللهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَصُومَه شَعْبَان.َ

রোযা রাখার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে সর্বাধিক প্রিয় মাস ছিল শাবান মাস। —মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২৫৫৪৮; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৪৩১

এ হাদীসদ্বয় বলছে, রোযা রাখার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের কাছে শাবান মাস সর্বাধিক প্রিয় ছিল, তাই তিনি রমযান মাস ব্যতীত এ মাসেই সবচেয়ে বেশি রোযা রাখতেন। কিন্তু কেন তিনি শাবান মাসে এত বেশি রোযা রাখতেন?

এর উত্তর পাওয়া যাবে উসামা বিন যায়েদ রা. থেকে বর্ণিত একটি হাদীসে। ওই হাদীস থেকে শাবান মাসের গুরুত্ব ও তাৎপর্যের বিষয়টিও পরিষ্কার হয়ে যাবে। উসামা বিন যায়েদ রা. বলেন,

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম (রমযান ছাড়া) শাবান মাসে যত রোযা রাখতেন অন্য কোনো মাসেই এত রোযা রাখতেন না।

উসামা বিন যায়েদ রা. বলেন, আমি (একবার) বললাম—

وَلَمْ أَرَكَ تَصُومُ مِنْ شَهْرٍ مِنَ الشُّهُورِ مَا تَصُومُ مِنْ شَعْبَان.َ

আমি আপনাকে কোনো মাসেই এত রোযা রাখতে দেখিনি, শাবান মাসে আপনি যত রোযা রাখেন?

এ প্রশ্নের উত্তরে নবীজী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেন—

ذَاكَ شَهْرٌ يَغْفُلُ النَّاسُ عَنْهُ بَيْنَ رَجَبٍ وَرَمَضَانَ، وَهُوَ شَهْرٌ تُرْفَعُ فِيهِ الْأَعْمَالُ إِلَى رَبِّ الْعَالَمِينَ فَأُحِبُّ أَنْ يُرْفَعَ عَمَلِي وَأَنَا صَائِم.ٌ

শাবান হল রজব ও রমযানের মধ্যবর্তী মাস। এ মাস সম্পর্কে (অর্থাৎ এর গুরুত্ব ও তাৎপর্য সম্পর্কে) মানুষ গাফেল থাকে। শাবান হল এমন মাস, যে মাসে রব্বুল আলামীনের কাছে (বান্দার) আমল পেশ করা হয়। আমি চাই, রোযাদার অবস্থায় আমার আমল (আল্লাহর দরবারে) পেশ হোক। —মুসনাদে আহমাদ, হাদীস ২১৭৫৩; সুনানে নাসায়ী, হাদীস ২৩৫৭; মুসান্নাফে ইবনে আবি শাইবা, হাদীস ৯৮৫৮

শাবান মাসের প্রতি নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম কেন এত গুরুত্বারোপ করতেন, এই হাদীসে তিনি তা খুলে বলেছেন। তাঁর কথার মর্ম হল, এই মাসে বান্দার আমল আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়। কাজেই এ মাসটি গুরুত্বের দাবিদার। তাছাড়া সামনে রমযান আসছে, ফযীলতপূর্ণ মাস হিসেবে রমযানকে গুরুত্ব প্রদান করা হয়। শাবান মাসের আগে রজব মাস আছে, রজব মাস পবিত্র চার মাসের(১) একটি, তাই রজব মাসকেও গুরুত্ব প্রদান করা হয়। মাঝখানে শাবানের ব্যাপারে গাফলতি হয়ে যায়। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সতর্ক করলেন যে, দেখো, একটি বিশেষ দৃষ্টিকোণ থেকে এই মাসটিও গুরুত্বের দাবিদার। এ মাসে বান্দার গোটা বছরের আমলনামা আল্লাহর দরবারে পেশ করা হয়। তাই শাবান আল্লাহর দরবারে আমলনামা পেশ হওয়ার মাস। কাজেই এই মাসেরও যথাযথ কদর করা চাই। এ কারণেই আমি এ মাসে এত রোযা রাখি(২)।

ইমাম ইবনে রজব রাহ. এই হাদীস সম্পর্কে আলোচনা করতে গিয়ে একটি গভীর বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তিনি বলেছেন, (মর্ম) : এই হাদীসে এই ইঙ্গিত রয়েছে যে, কখনো কোনো একটা সময়, ব্যক্তি বা স্থানের ফযীলত প্রসিদ্ধ হয়ে যায়, তখন সবাই সেই প্রসিদ্ধ স্থান, কাল, পাত্র নিয়েই ব্যস্ত থাকে। অথচ ভিন্ন বিবেচনায় অন্য কোনো স্থান, কাল, পাত্র সেই প্রসিদ্ধ স্থান, কাল, পাত্রের চেয়েও উত্তম হতে পারে। কিন্তঅনেকে সেদিকে লক্ষ করে না। —লাতায়েফুল মাআরিফ, পৃ. ২৫১

সুতরাং একাধিক ফযীলতের কারণে যেভাবে রমযান মাসকে গুরুত্ব প্রদান করা হয় এবং পবিত্র মাস হিসেবে আশহুরে হুরুম বা পবিত্র চার মাসকে যেভাবে গুরুত্ব প্রদান করা হয়, তেমনি সারা বছরের আমলনামা পেশ হওয়ার মাস হিসেবে শাবান মাসকেও যথাযথ গুরুত্ব প্রদান করা কর্তব্য। আর এই গুরুত্ব প্রদান করার উপায় হল, সবধরনের গুনাহ থেকে বেঁচে থেকে নেক আমলের প্রতি যত্নবান হওয়া। শাবান মাসের অধিকাংশ দিন রোযা রেখে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম উম্মতকে এই নির্দেশনাই দিয়ে গেছেন।

প্রসঙ্গত, এখানে উল্লেখ করে দেওয়া প্রয়োজন, সহীহ হাদীসে আছে, আল্লাহর দরবারে প্রতিদিন বান্দাদের আমলনামা পেশ করা হয়। দিনের আমলনামা রাতে আর রাতের আমলনামা দিনে পেশ করা হয়। (দ্র. সহীহ মুসলিম, হাদীস ১৭৯) এটি হল প্রতিদিনের আমলনামা। অপর একটি সহীহ হাদীসে আছে যে, সপ্তাহে সোমবার ও বৃহস্পতিবার আমলনামা পেশ করা হয়। (দ্র. সহীহ মুসলিম, হাদীস ২৫৬৫) এটি হল সাপ্তাহিক আমলনামা। আর একবার পেশ করা হয় বাৎসরিকভাবে। সেটা হল শাবান মাসে। এখানে সেটার কথাই বলা হয়েছে। (দ্র. লাতায়েফুল মাআরেফ, পৃ. ২৪৪)

শাবান মাসের রোযা:

উপরিউক্ত বর্ণনাসমূহ থেকে স্পষ্ট যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম আল্লাহর দরবারে আমলনামা পেশ করা হবে—এ বিষয়টির প্রতি গুরুত্বারোপ করে শাবান মাসে সর্বাধিক রোযা রাখতেন। তাই শাবান মাসে অন্যান্য নেক আমলের পাশাপাশি সামর্থ্য অনুযায়ী রোযা রাখার চেষ্টা করা কর্তব্য। কিন্তু রোযা রাখবে শাবান মাসের ২৭ তারিখ পর্যন্ত। হাদীসে রমযানের এক-দুই দিন আগে রোযা রাখতে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। (দ্র. সহীহ বুখারী, হাদীস ১৯১৪)

লাইলাতুন নিসফি মিন শাবানের ফযীলত:

শাবান মাসের একটি ফযীলত হল, অর্ধ-শাবানের রাত। অর্থাৎ চৌদ্দ শাবান দিবাগত রাত। এ রাতের বিশেষ ফযীলতের কথা বর্ণিত হয়েছে। একটি হাদীসে আছে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন—

يَطَّلِعُ اللهُ إِلَى خَلْقِهِ فِي لَيْلَةِ النِّصْفِ مِنْ شَعْبَانَ فَيَغْفِرُ لِجَمِيعِ خَلْقِهِ إِلَّا لِمُشْرِكٍ أَوْ مُشَاحِنٍ.

আল্লাহ তাআলা অর্ধ-শাবানের রাতে তার সৃষ্টির দিকে (রহমতের) দৃষ্টি দেন অতঃপর তিনি তার সকল সৃষ্টিকে ক্ষমা করে দেন কেবল শিরককারী এবং বিদ্বেষপোষণকারী ব্যতীত।

(এই দুই শ্রেণিকে ক্ষমা করেন না)। —সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৫৬৬৫; শুআবুল ঈমান, বাইহাকী ৩/৩৮২, হাদীস ৩৮৩৩

قال البيهقي: وقد روينا هذا من أوجه، وفي ذلك دلالة على أن للحديث أصلا من حديث مكحول.

এই হাদীসটি নির্ভরযোগ্য ও আমলযোগ্য। ইমাম ইবনে হিব্বান, ইমাম যাকীউদ্দীন মুনযিরী, যাইনুদ্দীন ইরাকী প্রমুখ হাদীস বিশারদ ইমামগণ হাদীসটিকে নির্ভরযোগ্য বলে মতামত দান করেছেন। (দ্র. সহীহ ইবনে হিব্বান, হাদীস ৫৬৬৫; আততারগীব ওয়াত তারহীব ২/১১৮; শরহুল মাওয়াহেব ৭/৪১২)

এই হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী অর্ধ-শাবানের রাতে আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে সবার জন্য রহমত ও মাগফিরাতের দ্বার উন্মুক্ত করা হয়। কেবল শিরকে লিপ্ত ব্যক্তি এবং অন্যের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারী ছাড়া সবাই এই মাগফিরাত ও রহমত প্রাপ্ত হয়।

কোনো বিশেষ সময়ের ব্যাপারে আল্লাহর পক্ষ থেকে রহমত ও মাগফিরাতের ঘোষণা আসলে করণীয় হল, সেই সময়ে সকল গুনাহ থেকে বিরত থেকে নেক আমলের প্রতি যত্নবান হওয়া, যেন আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাতের উপযুক্ত হওয়া যায়।

এ হাদীস ও অন্যান্য হাদীসে মাগফিরাতের ঘোষণা থাকার কারণে বহু আগ থেকেই গুনাহ মুক্তির রাত হিসেবে এ রাতকে শবে বরাত তথা 'মুক্তির রজনী' নামে অভিহিত করা হয়। কাজেই এ রাতে গুনাহ মুক্তির জন্য সর্বোচ্চ চেষ্টা কাম্য। পাশাপাশি অধিক নেক আমল ও দুআ-ইস্তিগফারের মাধ্যমে আল্লাহর মাগফিরাত ও রহমত প্রাপ্তির ঐকান্তিক চেষ্টা করাও কর্তব্য।

এ সম্পর্কে আরেকটি হাদীস:

হযরত আলা ইবনুল হারিস রাহ. থেকে বর্ণিত, আয়েশা রা. বলেন, একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম রাতে নামাযে দাঁড়ান এবং এত দীর্ঘ সিজদা করেন যে, আমার ধারণা হল, তিনি হয়তো মৃত্যুবরণ করেছেন। আমি তখন উঠে তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলি নাড়া দিলাম। তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলি নড়ল। যখন তিনি সিজদা থেকে উঠলেন এবং নামায শেষ করলেন, আমাকে লক্ষ করে বললেন, হে আয়েশা অথবা বলেছেন, হে হুমাইরা, তোমার কি এই আশঙ্কা যে, আল্লাহর রাসূল তোমার হক নষ্ট করবেন? আমি উত্তরে বললাম, না, ইয়া রাসূলাল্লাহ। আপনার দীর্ঘ সিজদা থেকে আমার এই আশঙ্কা হয়েছিল, আপনি মৃত্যুবরণ করেছেন কি না। নবীজী জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কি জানো, এটা কোন্ রাত? আমি বললাম, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলই ভালো জানেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম তখন ইরশাদ করলেন—

এটা হল অর্ধ-শাবানের রাত (শাবানের চৌদ্দ তারিখের দিনগত রাত)। আল্লাহ তাআলা অর্ধ-শাবানের রাতে তাঁর বান্দাদের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি দেন এবং ক্ষমপ্রার্থনাকারীদের ক্ষমা করেন এবং অনুগ্রহ প্রার্থীদের অনুগ্রহ করেন আর বিদ্বেষপোষণকারীদের ছেড়ে দেন তাদের অবস্থাতেই। —শুআবুল ঈমান, বাইহাকী ৩/৩৮২-৩৮৬ইমাম বাইহাকী রাহ. এই হাদীসটি বর্ণনার পর এর সনদের ব্যাপারে বলেছেন—

هذا مرسل جيد.

শবে বরাতের আমল

উপরোক্ত হাদীসে দীর্ঘ নফল নামায, দীর্ঘতম সময় সিজদা করার কথা আছে। সুতরাং এ রাতে নফল নামাযসহ অন্যান্য ইবাদত-বন্দেগীর প্রতি যত্নবান হওয়া কাম্য। যেমন নফল নামাযের সাধারণ নিয়ম অনুযায়ী দুই রাকাত করে যত রাকাত সম্ভব পড়তে থাকা, কুরআন কারীম তিলাওয়াত করা, দরূদ শরীফ পড়া, তওবা-ইস্তেগফার করা, দুআ করা এবং কিছুটা ঘুমের প্রয়োজন হলে ঘুমিয়ে নেওয়া। এমন যেন না হয় যে, সারা রাতের দীর্ঘ ইবাদতের ক্লান্তিতে ফজরের নামায জামাআতের সাথে পড়া সম্ভব হল না। খেয়াল রাখতে হবে, ফরয নামাযে যেন কোনোরূপ শৈথিল্য না হয়। কারণ, ফরয ইবাদতের গুরুত্ব সর্বাবস্থায় নফল ইবাদতের চেয়ে বেশি।

একটি বিষয় মনে রাখতে হবে, অনেক অনির্ভরযোগ্য ওযীফার বই-পুস্তকে এই রাতে নামাযের যে নির্দিষ্ট নিয়ম-কানুন লেখা আছে, যেমন এত রাকাত হতে হবে, প্রতি রাকাতে এই সূরা এতবার পড়তে হবে ইত্যাদি—এগুলো ঠিক নয়। বরং স্বাভাবিকভাবে যেকোনো সূরা দিয়ে দুই রাকাত করে নফল নামায পড়বে। (দ্রষ্টব্য : আলআছারুল মারফূআ, আবদুল হাই লাখনোভী, পৃ. ৮০-৮৫)

এ রাতের করণীয় সম্পর্কে ইমাম ইবনে রজব রাহ. বলেছেন, (মর্ম) ‘মুমিনের কর্তব্য এই যে, এ রাতে খালেস দিলে তওবা করে যিকির, দুআ ও ইস্তেগফারের জন্য প্রস্তুত হয়ে যাবে। যত্নের সঙ্গে নফল নামায পড়বে। সওয়াব লাভের আশা নিয়ে পনেরো তারিখের রোযাও রাখবে। কেননা কখন মৃত্যু এসে যায় বলা যায় না। তাই কল্যাণের মওসুম শেষ হওয়ার আগেই তার মূল্য দেওয়া কর্তব্য। তবে অত্যন্ত জরুরি বিষয় হল, ওইসব গুনাহ থেকে বেঁচে থাকা, যেগুলো এ রাতের সাধারণ ক্ষমা ও দুআ কবুল হওয়া থেকে মানুষকে বঞ্চিত করে দেয়। যথা : শিরক, হত্যা, বিদ্বেষ। এগুলো সবই কবীরা গুনাহ। আর বিদ্বেষ তো এতই গর্হিত বিষয় যে, এটা অধিকাংশ সময়ই মানুষকে আল্লাহর রহমত ও মাগফিরাত থেকে দূরে সরিয়ে দেয়।

যেকোনো মুসলমান সম্পর্কেই বিদ্বেষ পোষণ করা অত্যন্ত মন্দ প্রবণতা। তবে সাহাবায়ে কেরাম ও সালাফে সালেহীন সম্পর্কে অন্তরে বিদ্বেষ বিদ্যমান থাকা অত্যন্ত ভয়াবহ ও গর্হিত অপরাধ। এজন্য মুসলমানদের কর্তব্য হল, সর্বদা অন্তরকে পরিষ্কার রাখা এবং হিংসা-বিদ্বেষ থেকে পাক-পবিত্র রাখা। বিশেষত উম্মাহ্র পূর্বসূরি ব্যক্তিদের সম্পর্কে অন্তর পুরোপুরি পরিষ্কার থাকা অপরিহার্য, যাতে রহমত ও মাগফিরাতের সাধারণ সময়গুলোতে বঞ্চিত না হতে হয়।' —লাতাইফুল মাআরিফ, পৃ. ২৬৫

এ রাতের নফল আমলসমূহ সম্মিলিত নয়, ব্যক্তিগত

আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এ রাতের নফল আমলসমূহ, বিশুদ্ধ মতানুসারে একাকীভাবে করণীয়। ফরয নামায তো অবশ্যই মসজিদে আদায় করতে হবে। এরপর যতটুকু নফল পড়ার তা নিজ নিজ ঘরে একাকী পড়বে। এসব নফল আমলের জন্য দলে দলে মসজিদে এসে সমবেত হওয়ার কোনো প্রমাণ হাদীস শরীফেও নেই আর সাহাবায়ে কেরামের যুগেও এর রেওয়াজ ছিল না। (দ্র. ইক্তিযাউস সিরাতিল মুসতাকীম ২/৬৩১-৬৪১; মারাকিল ফালাহ, পৃ. ২১৯)

তবে কোনো আহ্বান ও ঘোষণা ছাড়া এমনিই কিছু লোক যদি মসজিদে এসে যায়, তাহলে প্রত্যেকে নিজ নিজ আমলে মশগুল থাকবে, একে অন্যের আমলের ব্যাঘাত সৃষ্টির কারণ হবে না।

শবে বরাতের বর্জনীয় কাজ

কোনো কোনো জায়গায় এই রেওয়াজ আছে যে, এ রাতে মাগরিব বা এশার পর থেকেই ওয়াজ-নসীহত আরম্ভ হয়। আবার কোথাও ওয়াজের পর মিলাদ-মাহফিলের অনুষ্ঠান হয়। কোথাও তো সারা রাত খতমে-শবীনা হতে থাকে। উপরন্তু এ সবকিছুই করা হয় মাইকে এবং বাইরের মাইকও ছেড়ে দেওয়া হয়।

মনে রাখতে হবে, এ সবকিছুই ভুল রেওয়াজ। এ রাতে মাইক ছেড়ে দিয়ে বক্তৃতা-ওয়াজের আয়োজন করা ঠিক নয়। এতে না ইবাদতে আগ্রহী মানুষের পক্ষে ঘরে বসে একাগ্রতার সাথে ইবাদত করা সম্ভব হয়, আর না মসজিদে। অসুস্থ ব্যক্তিদের বিশ্রামেও মারাত্মক ব্যাঘাত ঘটে। আল্লাহ আমাদের এসব ভুল কাজকর্ম পরিহার করার তাওফীক দিন।

এ রাতের আপত্তিকর কাজকর্ম

এছাড়া এ রাতে বেশ কিছু আপত্তিকর কাজকর্মও দেখা যায়। যেমন,মহিলারা অনেক সময় নষ্ট করে হালুয়া,রুটি বানানোতে ব্যস্ত থাকে।আর এটাকে তারা ইবাদত মনে করে।যে যতো সুন্দর খাবার তৈরী করে তার সাওয়াব বেশি এটাও মনে করা হয়।যদিও এ দিনে পাড়াপ্রতিবেশিদেরকে হালুয়া, রুটি,সেমাই দেয়া হয় এতে আন্তরিকতা বাড়ে।কিন্তু কোনো বিশেষ দিনকে ঘিরে এমনটি করার কোনো রীতিই গ্রহণযোগ্য নয়।কুরআন হাদিস দ্বারা এটি রমাণিতও নয়।তাছাড়া এই দিনে মসজিদ, ঘর-বাড়ি বা দোকানপাটে আলোকসজ্জা করা, পটকা ফুটানো, আতশবাজি, কবরস্থান ও মাযারে ভিড় করা, কবরস্থান ও মাযারে আলোকসজ্জা করা, মহিলাদের বিনাপ্রয়োজনে ঘরের বাইরে যাওয়া, বিশেষত বেপর্দা হয়ে দোকানপাট, মাযার ইত্যাদিতে ভিড় করা, তরুণ ও যুবক ছেলেদের সারারাত শহরের অলিতে গলিতে ঘুরে বেড়ানো, হৈ-হুল্লোড় করা—এসব কিছুই আপত্তিকর কাজ। শায়েখ আবদুল হক মুহাদ্দিসে দেহলভী রাহ. বলেন, এই রাতের নিকৃষ্ট বেদআতসমূহের মাঝে নিচের বিষয়গুলো অন্তর্ভুক্ত—ঘর-বাড়ি, দোকানপাট আলোকসজ্জা করা, হৈ চৈ ও আতশবাজির উদ্দেশ্যে সমবেত হওয়া ইত্যাদি। এগুলো সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন এবং এগুলোর স্বপক্ষে কোনো জাল রেওয়ায়েতও

পাওয়া যায় না। সম্ভবত হিন্দুদের ‘দেওয়ালী’ প্রথা থেকে তা গ্রহণ করা হয়েছে। —মা ছাবাতা বিস সুন্নাহ, পৃ. ৩৫৩-৩৬৩

শবে বরাতে কৃত কিছু কাজ তো অন্য সময়েও হারাম। আর কিছু কাজ আছে, যা অন্য সময় করা জায়েয, কিন্তু শবে বরাতে সেগুলোর পেছনে পড়ে শবে বরাতের আমল থেকে বঞ্চিত হওয়া কিছুতেই ঠিক নয়। যেমন খিচুড়ি বা হালুয়া-রুটি রান্না করে নিজেরা খাওয়া বা গরিবদের খাওয়ানো। সাধারণ সময়ে এগুলো করা জায়েয। কিন্তু শবে বরাতে এগুলোর পেছনে পড়ে শবে বরাতের মূল কাজ তওবা-ইস্তেগফার, নফল ইবাদত প্রভৃতি থেকে বঞ্চিত থাকা একেবারেই ঠিক নয়। বস্তুত এগুলোও শয়তানের এক প্রকারের ধোঁকা, মানুষকে মূল কাজ থেকে বিরত রাখার জন্য শয়তান এসব কাজকর্মে মানুষকে ব্যস্ত করে দেয়।

শবে বরাতের পরের দিন শাবান মাসের ১৫ তারিখের রোযা

শবে বরাতের পরের দিন শাবান মাসের ১৫ তারিখ। এ দিন অনেকে রোযা রেখে থাকেন। এ সম্পর্কে একটি বিষয় জেনে রাখা প্রয়োজন। প্রতি চান্দ্র মাসে তিন দিন রোযা রাখা সুন্নত। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেও প্রতি মাসে তিন দিন রোযা রাখতেন, সাহাবীগণকেও মাসে তিন দিন রোযা রাখতে বলতেন। (দ্র. জামে তিরমিযী, হাদীস ৭৬০; ৭৬৩)

সে হিসেবে মাসে তিন দিন রোযা রাখা সুন্নাত। এই তিন দিন মাসের শুরুতেও হতে পারে, মাঝেও হতে পারে, আবার শেষেও হতে পারে। কিন্তু কিছু কিছু হাদীসে স্পষ্ট আছে যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সাহাবীদেরকে বিশেষভাবে মাসের ১৩, ১৪, ১৫ তারিখ (যাকে আইয়ামে বীয বলা হয়) রোযা রাখতে বলেছেন। (দ্র. জামে তিরমিযী, হাদীস ৭৬১; সুনানে আবু দাউদ, হাদীস ২৪৪৯; ফাতহুল বারী, ১৯৮১ নং হাদীসের আলোচনা)

এই হাদীসগুলোর ওপর ভিত্তি করে হাফেয ইবনে হাজার রাহ. বলেছেন, যে তিন দিনের কথা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলে গেছেন, সেই তিন দিন রোযা রাখাই সর্বোত্তম। (দ্র. ফাতহুল বারী, ১৯৮১ নং হাদীসের আলোচনা)

সে হিসেবে প্রতি মাসের আইয়ামে বীযে রোযা রাখা সুন্নত। শাবান মাসও এর ব্যতিক্রম নয়। তাই শাবান মাসের আইয়ামে বীযে (১৩, ১৪, ১৫) রোযা রাখাও সুন্নত। ১৫ তারিখ আইয়ামে বীযের অন্তর্ভুক্ত হওয়ার কারণে ১৫ তারিখ রোযা রাখাও সুন্নত।

বাকি থাকল একটি বর্ণনায় বিশেষভাবে ও পৃথকভাবে ১৫ শাবান রোযা রাখার কথা বর্ণিত হয়েছে। (দ্রষ্টব্য : সুনানে ইবনে মাজাহ, বর্ণনা ১৩৮৪) কিন্তু বর্ণনাটি শাস্ত্রীয় বিচারে দুর্বল। শাস্ত্রীয় বিচারে দুর্বল হওয়ার কারণে কেবল এই বর্ণনার ওপর ভিত্তি করে ১৫ শাবানের রোযাকে পৃথকভাবে সুন্নত কিংবা মুস্তাহাব মনে করা সঠিক নয় বলে মতামত দিয়েছেন মুহাক্কিক আলেমগণ।

তবে, যেমনটি পূর্বে বলা হল, ১৫ তারিখ আইয়ামে বীযের অন্তর্ভুক্ত—এ হিসেবে এই দিনের রোযাকে (১৩ ও ১৪ তারিখের রোযাসহ) নিঃসন্দেহে সুন্নত মনে করা যাবে।

মোটকথা, সর্বাবস্থায় শাবান মাসের ১৫ তারিখে রোযা রাখা যাবে। পূর্বের দুই দিন তথা ১৩ ও ১৪ তারিখের সঙ্গে মিলিয়ে একসঙ্গে তিন দিন রোযা রাখা যেমন যাবে, তেমনি পৃথকভাবে কেবল ১৫ তারিখও রোযা রাখা যাবে। এতে কোনো সন্দেহ নেই। তবে তিন দিন রাখাই উত্তম।

এমনিভাবে ১৫ তারিখ আইয়ামে বীযের একটি দিন হিসেবে ১৫ তারিখের রোযাকে সুন্নতও মনে করা যাবে। কিন্তু পৃথকভাবে শাবান মাসের ১৫ তারিখ বিশেষ একটি দিন, সে হিসেবে পৃথকভাবে এ দিনে রোযা রাখা সুন্নত—এমন ধারণা রাখা যাবে না।

এ প্রসঙ্গে শাইখুল ইসলাম মুফতী মুহাম্মাদ তাকী উসমানী দামাত বারাকাতুহুম বলেন, 'আরো একটি বিষয় হচ্ছে, শবে বরাত-পরবর্তী দিনে অর্থাৎ শাবানের পনেরো তারিখে রোযা রাখা। গভীরভাবে বিষয়টি উপলব্ধি করা প্রয়োজন। হাদীসে রাসূলের বিশাল ভাণ্ডার হতে একটি মাত্র হাদীস এর সমর্থনে পাওয়া যায়। তাতে বলা হয়েছে, 'শবে বরাতের পরবর্তী দিনটিতে রোযা রাখ'। সনদ ও বর্ণনার সূত্রের দিক থেকে হাদীসটি দুর্বল। তাই এ দিনের রোযাকে এই একটি মাত্র দুর্বল হাদীসের দিকে তাকিয়ে সুন্নত বা মুস্তাহাব বলে দেওয়া অনেক আলেমের দৃষ্টিতেই অনুচিত।

তবে হাঁ, শাবানের গোটা মাসে রোযা রাখার কথা বহু হাদীসে পাওয়া যায়। অর্থাৎ ১ শাবান থেকে ২৭ শাবান পর্যন্ত রোযা রাখার যথেষ্ট ফযীলত রয়েছে। কিন্তু ২৮ ও ২৯ তারিখে রোযা রাখতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম নিজেই বারণ করেছেন। ইরশাদ করেন, 'রমযানের দু-একদিন পূর্বে রোযা রেখো না।' যাতে রমযানের জন্য পূর্ণ স্বস্তির সাথে স্বতঃস্ফূর্তভাবে প্রস্তুতি নেওয়া যায়। কিন্তু ২৭ তারিখ পর্যন্ত প্রতিদিনের রোযাই অত্যন্ত বরকতপূর্ণ।

একটি লক্ষণীয় ব্যাপার হচ্ছে, শাবানের এই ১৫ তারিখ তো 'আইয়ামে বীয' এর অন্তর্ভুক্ত। আর নবীজী প্রতি মাসের আইয়ামে বীয এ রোযা রাখতেন। সুতরাং যদি কোনো ব্যক্তি এই দুই বিষয়কে সামনে রেখে শাবানের ১৫ তারিখের দিনে রোযা রাখে যা 'আইয়ামে বীয' এর অন্তর্ভুক্ত, পাশাপাশি শাবানেরও একটি তাৎপর্যপূর্ণ দিন, তবে ইনশাআল্লাহ নিশ্চয়ই সে সওয়াব পাবে। তবে শুধু ১৫ শাবানের কারণে এ রোযাকে বিশেষভাবে গুরুত্ব দিয়ে সুন্নত বলে দেওয়া অনেক আলেমের মতেই সঠিক নয়। আর সে কারণেই অধিকাংশ ফুকাহায়ে কেরাম মুস্তাহাব রোযার তালিকায় মুহাররমের ১০ তারিখ ও ইয়াওমে আরাফা (যিলহজ্জের ৯ তারিখ) এর কথা উল্লেখ করেছেন। অথচ শাবানের ১৫ তারিখের কথা পৃথকভাবে কেউইউল্লেখ করেননি। বরং তারা বলেছেন, শাবানের যেকোনো দিনই রোযা রাখা উত্তম। সুতরাং এ সকল বিষয়ের দিকে দৃষ্টি রেখে যদি কেউ রোযা রাখে, ইনশাআল্লাহ সে সওয়াব পাবে। তবে মনে রাখতে হবে যে, রোযা রাখার ব্যাপারে এ মাসের নির্দিষ্ট কোনো দিনের পৃথক কোনো বৈশিষ্ট্য নেই।'
—ইসলাহী খুতুবাত ৪/২৬৭-২৬৮

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে এটা বুঝা যায় যে,শবে বরাত অর্থাৎ 'লাইলাতুল নিসফিমিন শাবান' একটি গুরুত্বপূর্ণ রজনী।এই রাতটিকে হেলায় কাটানোর কোনো সুযোগ নেই।আল্লাহ তাআ'লার কাছ থেকে ক্ষমা পাওয়ার জন্য আমাদের সর্বদা ই চেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।আমাদের মনটাকে হিংসা থেকে মুক্ত রাখতে হবে। আমরা যখনই কারো ব্যাপারে হিংসাত্মক হবো,মনে হিংসা আসবে, তখনই তার বারাকাহর ব্যাপারে দোয়া করে দিবো।

আল্লাহ তাআলা ক্ষমাশীল।আমরা যদি এই রাতে বিশেষ কেনো আ'মল নাও করি তবুও আমরা হিংসুক ও মুশরিক না হলে আমরা ক্ষমা পেতে পারি বলে আশাবাদী । তবুও আল্লাহ তাআ'লা মহান।তার মহত্ব লাভ করতে আমরা এ রাতে,ঘরের ভিতর একাকী বেশি করে ইবাদত করবো।আমরা সালাত,কুরআন তিলওয়াত,জিকির -আযকার করে আল্লাহর কাছে কান্নাকাটি করে দোয়া করবো।

মুসলিম মানেই একই শরীর।এই শরীরের কোনো একটি অঙ্গ খারাপ থাকলে আমাদের হৃদয় ব্যথিত হয়।আমরা শবে বরাতের রাতে পুরো মুসলিম উম্মাহর জন্যে দোয়া করবো।আমাদের মুসলিম ভাই বোনরা বিভিন্ন দেশের, বিভিন্ন জায়গায় জুলুমের স্বীকার হচ্ছে।তাদের শান্তি,স্বাধীনতা চেয়ে দোয়া করবো।জালিমের পতনের দোয়া করবো।এভাবেই ইবাদতের মাধ্যমে আমাদের মুক্তির রজনী সমাপ্তি করে ফজরের সালাত আদায় করবো।

সুতরাং আমাদের মুক্তির জন্যে শবে বরাত একটি উত্তম সময় হতে পারে।তবে আমরা কোনো কিছুতেই বাড়াবাড়ি করবো না।প্রান্তিকতা পরিহার করে বরং ভারসাম্য পূর্ণ সহাবস্থান অবলম্বন করবো

রেফারেন্সঃ

১.শবে বরাতঃপ্রান্তিকতামুক্ত প্রামান্য একটি পর্যালোচনা;মুফতি তারেকুজ্জামান
২.শবে বরাত(লাইলাতুন নিসফি মিন শাবান)বাড়াবাড়ি ও ছাড়াছাড়ি!ভারসাম্যপূর্ণ সহিহ অবস্থান; মাসিক আল কাওসার